অবনঠাকুরের ছোটদের তিনটি সেরা গল্প



অবন ঠাকুরের ছোটদের

তিনটি সেরা গল্প

eBook Created By: **Sisir Suvro**

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৩৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, তৃতীয় সংস্করণ: নবম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৯ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক

মো, আলাউদ্দিন সরকার

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

১৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ

ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ

সুমি প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং

৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ

ধ্রুব এষ।

অলঙ্করণ

সৈয়দ এনায়েত হোসেন

মূল্য

একশত টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0032-2

ভূমিকা

বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাসে ঠাকুর পরিবারের সন্তানদের স্বর্ণোজ্জ্বল অবদান বিস্ময়কর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শিল্পচর্চা বা সৃজনশীলতার দিক থেকে ঠাকুর পরিবারের অন্য যে সন্তানের মহিমা বাঙালির কাছে অবিস্মরণীয় ও সর্বজনজ্ঞাত তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)। আধুনিক চিত্রশিল্পের চর্চায় অবনীন্দ্রনাথের অবদান শুধু বিশিষ্টই নয়, অনন্যও। তিনি নিজে ছবি আঁকার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রীতির প্রবক্তা তো ছিলেনই সেই সঙ্গে এই উপমহাদেশের শিল্পীদের এক উজ্জ্বল অংশকে তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত ধারায় এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মোগল চিত্রকলা ও ভারতবর্ষের প্রাচীন চিত্রকলার ঐতিহ্যবাহী ধারা থেকে নিজস্ব প্রতিভাত। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী বাংলাসাহিত্যের এক চিরস্থায়ী সম্পদ। আর বাংলা শিশুসাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ মধ্য আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতো দীপ্যমান তাঁর অসামান্য চিত্ররূপময় ভাষাশিল্পের কারণে। লেখার ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান প্রেরণা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে সাংস্কৃতিক পরিবেশের সমৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর। গান-বাজনা, নাটক, অভিনয়, সাহিত্য আলোচনা স্বদেশি আন্দালেনে অংশগ্রহণ, সমাজসেবা ইত্যাদি তীর ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কের দিক থেকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চাচাত ভাই। ছাটেবেলায় সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগে পড়াশোনা করেন অবনীন্দ্রনাথ। ছবি আঁকার ঝোঁক তাঁর তখন থেকেই। স্কুলে সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর ছবি আঁকার ক্লাস। অবনীন্দ্রর বড়

ভাইরাও ছিলেন ছবি আঁকার ব্যাপারে উৎসাহী। বাড়িতে নিয়মিত ছবি আঁকার শিক্ষক আসতেন। বড় ভাইরা যখন তেলরঙের ছবি আঁকা শিখতেন শিক্ষকদের কাছে তখন পাশে বসে দেখতে দেখতে একসময় নিজেও আঁকতে শিখলেন অবনীন্দ্রনাথ। এভাবে একসময় বড় ভাইদের সঙ্গে তারও স্থান হয়ে গেল ছবি আঁকার আসরে। ভালো আঁকতে পারায় সুনামও হল কিছুটা।

অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে ইয়োরোপীয় রীতির ছবি আঁকা শেখেন আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল গিলার্ডির কাছে। বিস্ময়কর মেধার অধিকারী অবনীন্দ্রনাথ মাত্র তিন মাস গিলার্ডির কাছে ছবি আঁকা শিখেই ইয়োরোপীয় রীতির ছবি আঁকায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। ছবি আঁকা শেখার এই পর্বেই সমগ্র ভারতবর্ষে শুরু হল স্বদেশি আন্দোলন—শুরু হল বিলাতি আচার, বিলাতি দ্রব্য বর্জন। এ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ তথা সমাজের শিক্ষিত অংশ ঝুঁকে পড়ল দেশীয় সংস্কৃতির দিকে। অবনীন্দ্রনাথও তখন অন্বেষণ করতে শুরু করলেন চিত্রশিল্পের ভারতীয় ভাষা। স্বদেশি ধারায় আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলো হচ্ছে ‘শাজাহানের মৃত্যু’, ‘শাহাজাহানের স্বপ্ন’, ‘কাচ ও দেবযানী, যমুনা তীর’, ‘ঋতুসংহার' ইত্যাদি। চিত্রশিক্ষার বিভিন্ন পর্যয়ে তিনি এক জাপানি অধ্যাপকের কাছে জাপানি রীতি এবং মোগল মিনিয়েচার ধারার ছবি আঁকাও শিখেছিলেন যা তার নিজস্ব ধারার ছবি আঁকায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যচর্চা শুরু করেন হঠাৎ করে, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে, তাঁর নিজের ভাষায়—রবিকার উৎসাহে। দীর্ঘ সময় অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি থেকেছেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে লেখার বেলায় অবনীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব এক ভাষারীতি। অবনীন্দ্রনাথের

লেখার পরিমাণ খুব বেশি নয়; সব মিলিয়ে মাত্র ছাব্বিশ সাতাশখানি বই। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক লীলা মজুমদার বলেন, "এ যেন কবিগুরুর কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশে পাথরের টিবি। কিন্তু পাথর এত ঝকঝকে, তার ভিতর থেকে এমনি আলো ঠিকরোয় যে মন বলে হীরে নয় তো? লিখতে শুরু করে ছাে‌টদের জন্য লেখার ব্যাপারেই তিনি ব্যয় করেছেন বেশি সময়। ছাে‌টদের জন্য লেখা নিয়ে অনেক কিছু ভেবেছেনও তিনি। এক জায়গায় ছাে‌টদের জন্য লেখা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, "খুব খানিকটা ন্যাকামাে‌র ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলা-কওয়াগুলাে‌কে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। শিশুকাল ন্যাকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না, সে যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিকের সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায়, বুঝতে চায় এবং বাে‌ঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায়।" অবনীন্দ্রনাথের ছোটদের জন্য লেখায় তার এ চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যায়। ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে তিনি নতুন নতুন ঘটনার উদ্ভাবন করেননি। ঘটনা উদ্ভাবনে রত না হয়েও তিনি মৌলিক এ কারণে যে শিশুদের মনে যে কবি ও চিত্রকর লুকিয়ে থাকে তার আত্মপ্রকাশ তাঁর ছাে‌টদের জন্য লেখায় যুগপৎ লক্ষণীয়। তাঁর গল্প বলার ঢঙটি অনেকটা মুখের ভাষার মতো, কোথায়ও আটকাবে না।

কবি ও চিত্রকরের এই আত্মপ্রকাশই তাঁর ছাে‌টদের জন্য সৃষ্ট রচনাগুলোকে অনন্যতা দিয়েছে। সে কারণেই "শকুন্তলা", "নালক", "ক্ষীরের পুতুল" মৌলিক রচনা। অসামান্য এবং অনন্য ভাষারীতি সমৃদ্ধ অবনীন্দ্রনাথের এই তিনটি রচনা। তাই একত্রে এ দেশের ছাে‌টদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

আহ্মাদ মাযহার

শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল –ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির-আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া –সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া। নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন। তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কী করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল-খেলবার সাথী

বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল- মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধ কথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল-আঁধার ঘরের মাণিক- ছোটো মেয়ে- শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে আপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি-দুধের বাছা- শকুন্তলা- মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধল।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার,

ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর-- সে-ও তার আপনার, এমন-কি— বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল— তার বড়োই আপনার দুই প্রিয়সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু—বড়োই ছোটো—বড়োই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ— ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে-সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল— তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ-ছাড়া আর কী কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন-গুন গল্প করা, নয় তো মরালী মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এইকাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসুয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।

++++++++++++++++++++++++++++++++

দুষ্মন্ত

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড়ো রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুব-দেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তরদেশের রাজা, দক্ষিণ-দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন।

সাত-সমুদ্র-তের-নদী--সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা--রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়ি খানায় কত সোনা রাপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত-সমুদ্র-তের-নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—' চল বঁধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িভে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল-থাল লুচি মন্ডা, ভারভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠান্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কী, রাজার আজ্ঞা!

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হটহট করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্য সামন্ত বন ঘিরতে লাগল-- বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি, পাতার মতো ছোটো ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচিছল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সারা পেয়ে বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠান্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে--শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ জালে ধরা, পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার, পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্য-সামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা

মাধব্য, কতদূরে, কোথায় পোড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়েখেলা করছিল আর শকুন্তলা, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা তিন সখী কুঞ্জবনে গুন-গুন গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার-- সেই হরিণ— ঊর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা—দুজনে দেখা হল!

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে নানা, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ‘ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়’ করে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়! বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে! সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে

সর্বদা ভয়--ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে--'মহারাজ, রাজ্য ছারেখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন'।

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা! হো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে। দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কী করছে?

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে-এই বার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কী হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কী হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কী হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা--দুজনে মালা-বদল হল। দুইসখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তার পর কী হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুনতলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন--'সুন্দরী তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে। নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কতদিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটীর দুয়ারে—দুজনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-দুয়ারে, পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

++++++++++++++++++++++++++++++++

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্ততলা জান্তেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না।একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়- কথায় যাকে-তাকে ভষ্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর তাঁকে প্রণাম করলে না, বস্তে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন-' কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি-যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে না চিনতে পারে।’

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল যে দেখবে কে এল, কানে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন-সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনসূয়া প্রিয়ম্বদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।কত সাধ্য-সাধনা করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল- 'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়ে গিয়েছেন, সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পরবে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কণ্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কণ্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাতাহবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না।

প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের-হার নিলে অনসূয়া গন্ধ-ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তারা মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে

কপালে সিদুঁর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তার কি এই সাজ? ---হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়? শকুন্তলা কোনদিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে? –না, তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। এক দণ্ডে এত মায়া এত ভালোবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণ শিশুকে তাত কণ্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কণ্ব ফিরলেন!

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—‘ দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।’

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কণ্বকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল--বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এককোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে, শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংতির কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাতমহল বাড়ি, তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা --সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির--সেখানে সোনার দেয়ালে মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথিশালা— সেখানে সোনার থালায় দুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা--সেখানে নাচ চলছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সংগীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজাদুষ্মন্ত বসে আছেন। দক্ষিণ-দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কী চাও? টাকাকড়ি চাও, না, ঘর-বাড়ি চাও? কী চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়ি চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, এ কী কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও--এ কেমন কথা?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সে কী কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা--আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই,

মহারাজা, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুনগুন গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলাম। তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে --দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব! --শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজা, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কত কি কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে?

যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে আংটি, পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে--নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনি করে কি কথা রাখলে?’

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—‘কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?’

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাতরাজার ধন এক মানিকের-বরণ আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল। রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল, অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রূপোলি রঙের সরলপুটি, চাঁদের মতো পায়রা-চাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁঠা-ভারা বাটা কত কী জালে পড়ল তার ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল, জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, এ-পার ও-পার দু-পার জুড়ে জলে পরল। সেই সময় মাছের সর্দার নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলে পাড়ায় রব উঠল-- জাল কাটবার গুরু মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড়ো মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিকরে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরিব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়েছিলেন--এ সেই আংটী। শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলে ছিল।

জেলের হাতেরাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই। কেবল—'হা শকুন্তলা!—হা শকুন্তলা!'

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই--কোথাও সুখ নেই।

সংগীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ, বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজাদুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে, ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে রাজা রাজ্যে ফিরছেন-- এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত –শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনই বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়োই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত--এই তার রাজসিংহসন। দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল শুক-পাখি তার প্রিয়সখা কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায়, পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত--কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিথে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র। ভাবছেন--পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল। রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসা শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজারানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে রাজারানী সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

++++++++++++++++++++++++++++

নালক

দেবলঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার-গঙ্গা ওপার-গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরো একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এদিক- সেদিক, এধার-ওধার সে-ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো!

এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনো দেখেনি। আকাশ-জুড়ে কে যেন সাত-রঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনো দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপর আলোর একটি-একটি ধাপ গেঁথে দিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—‘কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেক।’

বনের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তর-মুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি। কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির মঠ। আর ওধারে--অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—শাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ-জুড়ে আশ্চর্য এক শাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন। রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, “মহারাজ, কি চমৎকার স্বপ্নই

দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা-বাঁকা কচি দুটো দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানী স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে, রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসীতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানীর পোষা ময়ূর ছাদে এসে উঠে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরী এসে 'জয় রানীমা বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানীর স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল। কপালে রক্ত-চন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলী, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢাল-খাঁড়া নিয়ে। রাজার দুইদিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশবিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাঁদের ঘিরে যত দুয়ারী--মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল-পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারি উপরে রাজার আট গণৎকার খড়ি-হাতে. পুথি খুলে, রানীর স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারো মাথায় পাকা চুল, কারো মাথায় টাক,

কারো বা ঝুঁটি বাঁধা, কারো বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক-এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানীর স্বপ্নের ফল গুণে বলছেন; সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ-দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।'

চারিদিকে আমনি রব উঠল—'আনন্দ কর, আনন্দ কর। অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর।'

আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজ-ছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার-দেওয়া কণ্ঠ-মালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানীর দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলে-বুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলী আনন্দে দুলতে থাকল। প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলি গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শাল গাছ, তার ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু কুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে-দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে-দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ

সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়—কোনোখানে কোনো-কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না। রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত! পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর একপারে সোনার শিখা, আর একপারে রুপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধিপুজোয় শাঁক-ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী-সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানীকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায়-ছায়ায় চলে ফিরে, রানী এসে বাগানের মাঝে প্রকান্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন--বাঁ হাতখানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডানহাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে-ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারিদিক আলোয়-আলো হয়ে গেল—কোনোখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর এক ফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর, এতটুকু। দেখতে-দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে-মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্ত্যের ঘরে-ঘরে শাঁখঘণ্টা, পাতালের তলে-

তলে—জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপরে প্রথম সাত-পা চলে যাচ্ছেন। সুন্দর পা দুখানি যেখানে-যেখানে পড়ল সেখানে-সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি-একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত-সমুদ্রের জল এনে সেই-সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝির-ঝির করে ঢালতে লাগল!

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানবে মিলে সেই সাতপদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন—‘দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন। চল, বাড়ি চল? মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল— ছেড়ে দাও মা, তারপর কি হল দেখি! একটিবার ছাড়। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ!

নালক তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন—‘ওকাস অহং ভন্তে।’ নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বলছেন— লেখ অনুগ্ গহং কত্ব সীলং দেথ মে ভন্তে।’ নালক বড়-বড় করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—‘সীলং দেথ মে ভন্তে।’ কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই। তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে। পাঠশালের খোড়ো-ঘরের জানলা দিয়ে একটি তিন্তিড়ী গাছ,

খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটায় এসে পড়ে, একটা লালঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুবকুব করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন-ভন করে উড়ে বেড়ায়—একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময় গুরু বলে ওঠেন— লেখরে লেখ!

অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খস-খস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে নালক যে কি কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না, তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে—য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও! নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে-হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা-কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে-মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ঐ পাঠশালার খোড়ো চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে-চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরের বাইরে বাতাস শন-শন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে-মনে ডাকতে থাকে, ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে-জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনোদিন কপাটও

খোলে না, দেয়ালও পড়ে না—যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই—সবাই ইচ্ছামতো খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঋষির আশাপথ চেয়ে নালক দিন গুণছে, ওদিকে দেবলঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে-নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে-গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—

‘নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।
নমো নমো গৌতম চন্দ্রিমায়।
নমো অনন্তগুণার্ণবায়,
নমো শাক্যনন্দনায়।’

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে-মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে-দলে ঘর ছেড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে—কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানক্ষেত নিড়োতে, কেউবা সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনো কাজ নেই তারাও দল-বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—‘নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়!

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনোখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশ-গঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবলঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়। মায়ের কোলে ছেলে শুনছে—'নমো নমো গোতমচন্দ্রিমায়! ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নমো নমো; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নোমো কর, নোমো কর।"

গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে—নমো নমো নমো! রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীবাদ করছেন— সুখী হও, মুক্ত হও। ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ঋষিকে বলছেন—"নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বলছেন—"দুঃখ কর না, আজ থেকে পয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কর না; এস, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও। ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

‘কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগগহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।

নির্মল আকাশের নিজে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন। আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা! গাছের নিচে দেবলঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝক ঝক করছে। নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা-গোছা অশথ-পাতায়, মোটা-মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিক-ঝিক করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ! এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনো দিকে কোনো সাড়া নেই, কারো মুখে কোনো কথা নেই, কেবল এক-একবার দেবলঋষি বলছেন—তার পরে? আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে: ‘রাজ শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছাল-ঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুই পাশে চার-চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গোতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দুর্বা, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো। ‘পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন–রাজপুত্রের নাম হল কি?

‘ব্রাহ্মণেরা বলছেন—এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেইজন্য এর নাম রইল সিদ্ধার্থ; রাজা হলে এই রাজকুমার

জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বন্ধুত্ব লাভ করে জগৎকে কৃতার্থ করবেন আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্য এর নাম হল সিদ্ধার্থ।

'রাজা বলছেন—কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা করে বলছেন। প্রথম শ্রীরাম আচার্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুইদিকেই সমান টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুই চোখ বুজে বলছেন—দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুই হাত ঘুরিয়ে বলছেন—হ্যাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন দুইদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ঐ কথা। ভোজ দুই চোখ পাকল করে বলছেন—এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এদিকও দেখলেম, ওদিকও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বললেন—দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যায় সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনোদিকেই যাবেন না স্থিরনিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যেদিন এর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারী পড়বে, সেদিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।'

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে। আর কিছু দেখা যায় না! সেদিন থেকে নালক যখনি ধ্যান করে তখনি দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝক-ঝক করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে--

সোনার-ইটে বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখি উড়ে-উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাঁধা পেয়ে ফিরে-ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এপারে রয়েছে নালক-- যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্বাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয়, জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, শাদা মেঘ পাতলা হওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে, শীতে যখন বরফ আর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়; আবার বসন্তে ফুলে-ফুলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে, দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে-ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দেয়ালে-ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনি করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতো। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা

পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে, বসন্তের প্রহরে প্রহরে—কখনো কোকিলের কুহু কখনো বাতাসের হুহু, কখনো বা বৃষ্টির ঝর-ঝর, শীতের থর-থর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে-কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এস, বাহিরে এস, নিস্তার কর, নিস্তার কর। ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখ চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল। আনন্দ—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো—এই আছে এই নেই; সুখ—সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন—সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল—সে তো চিরদিন থাকে না! হায়রে, সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেক না, ফুলের ফাঁস ছিড়ে ফেল, বাহিরে এস—নিস্তার কর। জীবকে অভয় দাও! নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনো বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনো ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে; আলো হয়ে ডাকছে—এস! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর। রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে জগৎ-সংসারের হাসি-কান্না, জীবন-মরণ—রাতে-দিনে মাসে-মাসে বছরে-বছরে নানাভাবে নানাদিকে। একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কি তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে-

তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে চল, চল, চলরে চল। আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে শাদা পাল তুলে, বাতাস চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে।

আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশদিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল তীরে-বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ—সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা, সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না!

শান্তির মাঝে, কাজে কর্মে, আমোদে-আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন—কান্না আর কান্না! জগৎ-জোড়া কান্না! ছোটর ছোট তার কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।

দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সেদিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে-বনে পাখিরা, গ্রামে-গ্রামে চাষীরা, ঘরে-ঘরে ছেলে-মেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন—আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়—সকলি আনন্দ। মাঠের

মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে! বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে-ঘরে আনন্দ ছেলে-মেয়ের হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন খেলনায় ঝিক-ঝিক করছে, ঝুম-ঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে-পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে-আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, শোক নেই, কান্না নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ—ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে-গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না। এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে নিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়! বয়েসের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে; কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না—কেবল দুখানা পোড়া। কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি-গুটি, একা। তার শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলে-মেয়ে বন্ধু-বান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে—

সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখ শোক, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে—আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে, গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালো ছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে—"আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারো নিস্তার নেই—আমি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল—নতুন যা কিছু পুরোনো হয়ে গেল, টাটকা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন—পাহাড় ধ্বসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে সব গুড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে শাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে, ছেড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে-পায়ে গুটি-গুটি—অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা—সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে, সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে, সব শুষে নিয়ে, সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে-হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে-আস্তে

বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে—সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে! ফুল-ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে-মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনের বনে-বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে—কানের কাছে, প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে—খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোর নিচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে। আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলোছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুর-ফুরে দখিন বাতাস—জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাইরে—সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনের পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—সারি-গানের তালে-তালে সুখসাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়ছে, সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে, অস্বস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে, সুখে রয়েছে, শান্তিতে রয়েছে।

এমন সময় পদ সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাঙাশ মূর্তি—জ্বরে জর্জর রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না—ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনো সে শীতে কাঁপছে, কখনো বা গায়ের জ্বালায় সে জল-জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ-দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত

গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাণ্ডাশ, হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালা- যন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিবে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা, সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো-কাদা-মাখা জ্বরের সেই পাণ্ডাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে—ধ্বক, ধ্বক! তারি তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে একবার জ্বলছে, বাতাস একবার আসছে একবার যাচ্ছে। জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনো তিনি শুনছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায়-পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধ্বক, ধ্বক! এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যেদিকে দিন শেষ হচ্ছে, যেদিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সেদিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের-নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাই-বাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখালছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিনগাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে সবাই ঘরে আসছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশপিদিম, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে।

তুলসীতলায় দুগগো পিদিম—যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনের পাশে, বন্ধু-বান্ধবের মাঝখানে।

ভিখারী যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে "এল মা ওমা ঘরে এল মা। মিলনের শাঁখ ঘরে-ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলা-ধরার সুর, েআকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়োরে উকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে। শূন্য-প্রাণ, খালি-বুক ভরে উঠছে আজ ফিরে-পাওয়া সুরে, বুকে-পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে-পাওয়া সুরে! সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন-একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে পারে। ভরা নদীর মতো ভরপূর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎ-সংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই, কোনো ঠাই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে-দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোনখানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোন এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খনখন করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে, আছে, দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে

দিয়ে একটা বুক ফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরের বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল—সে কান্না! সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন! আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব কটি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে! পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই প্রহরে জলে-স্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন শাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে-আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে-ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে-নিবতে, নিবতে-জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না—কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা-জুড়ে জলে-ভরা কালো মেঘ, কাঁদো-কাঁদো দুখানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে। চোখের জলের মতো বৃষ্টির এক-একটি ফোটা ঝরে পড়ছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর! তারি মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—শাদা চাদরে ঢাকা হাজার-হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে, কোলে করে, বুকে ধর। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনোশব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে-ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনো কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যেদিকে সূর্য ডোবে, যেদিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহা-শ্মশানের ঘাটের মুখে-মুখে, দূরে-দূরে, অনেক দূরে—ঘর থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার, কাঁদিয়ে যাবার পথে। এপারে ওপারে

মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ! থেকে-থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক-একটা দমকা বাতাসে রাশি-রাশি ছাই উড়ে এসে সেই মরণ-পথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল শাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাশ করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব জ্বালানো, সব-পোড়ানো গরম ছাই। আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা-কিছু যত-কিছু সব ছাই ভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে দূরে-দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা মেঘের মতো। তারি তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে হায় হায় হায়রে হায়! সেদিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা-মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়। আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচু-নিচু ছোট বড় সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটি পাখি উড়ে

চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কি আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; শাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্ছা গেছে।

সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় শাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে-রঙে ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা যাবে না? চারিদিকে নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ আসছিল না। সেই না- রাত্রি-না-দিন, না-আলো-না-অন্ধকারের মাঝে কোনো সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেকছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পদ; তারি ভিতর দিয়ে জরা উকি মারছে—শাদা চুল নিয়ে; জ্বর কাঁপছে—পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে-- বরফের মতো হিম শাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, শাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎ-সংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন–জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্ত-মাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা—তিনটে শিকারী কুকুরের মতো ছুটে চলেছে মহাভয়ের সঙ্গে-সঙ্গে, দাঁতে নখে যা-কিছু সব চিরে ফেলে, ছিড়েফেলে, টুকরো-টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে; পর্বতে এসে

তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চুর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—আগড় ভেঙে, শিকড় ছিড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা। ছোট-বড় সব উড়ে চলছে –ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে—সব নিবে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না। আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার-মার করে ছুটে আসছে ভয়, জলে-স্থলে ঘরে-বাইরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি! কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি-বিকুলি করছে। হাজার-হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে রক্ষা কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে! এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ-সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিড়ে?

সিদ্ধার্থের কথার উত্তরে-দক্ষিণে শব্দ উঠল—বিদ্ধা মহিদ্ধিকা—মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকসস লোকসস সব্বে এতে পরায়ণ।

দীপা, নাথা পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।

গতি, বন্ধু, মহাস্‌সাসা, সরণা চ হিতেসিনো ॥
মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাবাবলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা ॥

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভ, মহাতেজ, মহাজ্ঞানী, মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকুলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে-দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গেল। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে-সবুজে পাতায়-পাতায় ফুলে-ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে-গানে বনে-উপবনে সেই আলো। বাহিরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ-মত্য-পাতালে—সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন—সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে বলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন-- সবাইকে অভয় দিয়ে, আন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের

কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ! যেমন আর-দিন, সেদিনও তেমনি–রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে, সেই মায়া-জালে-ঘেরা সোনার-স্বপনে-মোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে-ধারে কত অজানা দেশের পথে-পথে—এক নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রাণী যশোধরা–তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে-ঘরে সাত রঙের আলোর মালা কিছুতে আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—সে রইল না, সে রইল না। ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি বন্ধুবান্ধব। আর সব আকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ—তাঁর মন যে-দিকে গেছে।

সেদিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন—“ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এস। সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিম্নে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন—অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী; সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ! ছন্দক চলেছে কপিলবাস্তুর

দিকে—সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে—দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে। ছোট নদী—দেখতে এতটুকু, নামটিও তার নমা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে-পার থেকে নামলেন সে-পারে ভাঙন জমি—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে-পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে-পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে-গাছে ছায়া-করা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল-বালি ধুয়ে ঝির-ঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন। নদী—সে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আম-কাঁঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোট-ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে—কখনো পুব মুখে, কখনো দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে-ধারে ছাওয়ায়-ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে-সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জামগাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে; তারি তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাত দিন, সাত রাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশো চেলা নিয়ে, আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তত্তর কতই শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না। তিনি আবার চললেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার

সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে—নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে, চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনোদিন সে নগরে আসেনি। যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁরদিকে চেয়ে আছে। তাঁকে দেখে কারো ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে দেখতে! কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না। রাজপথের এপার-থেকে-ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানী চাচ্ছে দোকান লিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারী সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে—ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনো লোকের মন ভরেনি। তারা মণিমুক্তো সোনারুপো ফুলফল চালডাল স্তুপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না। রাজা-প্রজা ছোট-বড়—সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সেদিন রাজগেহের দ্বারে-দ্বারে পথে-পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনোদিন দেবেও না, পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনারুপো বসন-ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগেহের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যেতত ঐশ্বর্য কোনো রাজা কোনো দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য

কেবল এক-মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের যত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে চলে গেলেন। উদরক পণ্ডিত সাতশো চেলা নিয়ে গয়ালী পাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্র শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনেই সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনো ধর্ম কোনো শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন—"দুঃখ যায় কিসে?

উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন—এস, তুমি আমি দুজনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশবিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশো চেলা ভারে-ভারে মোণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে। সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুণে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন। অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন

বলেছেন, তেমনি করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন। কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা—শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনো করেনি। কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর এক বিন্দু রক্ত রইল না—দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কিনা! সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে-একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না—যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। এমনি করে অনেকদিন কেটে গেছে। সেদিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে-গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল।

সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে-উড়ে গেয়ে-গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে-একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেক দিন পরে শিষ্যরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দুটি চোখের পাতা একটু-একটু কাঁপছে—বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাঁপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ-বেলার সিঁদুর আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া বসনের মতো। একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ুর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণ ভরে একবার নেচে দিচ্ছে। সেইসময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন—শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারি একটা ডাল ধরে আস্তে-আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা

কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চলবেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন— প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পারলেন কি?

সিদ্ধার্থ ঘাড়নেড়ে বললেন, না—এখনো না। অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন—‘প্রভু, তবে আর-একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন—দুঃখের শেষ আছে কিনা। সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—‘নারে। নারে। নাইরে নাই?

কৌণ্ডিন্য বললেন—জানবার কি কোনো পথ নেই প্রভু?

সিদ্ধার্থ বললেন—পথের সন্ধান এখনো পাইনি, কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগ্যোগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনো কাজ অসম্ভব। শরীর সবল রাখ, মনকে সতেজ রাখ। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর মনকে বেশী আরাম দেবে না, বেশি কষ্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারবে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনো সুরই বাজে না, তেমনি শরীর মনকে আরাম আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্ম হয়ে থাকে। বৃথা যোগ্যোগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য বিলাসে তাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই—মাঝের পথ ধরে

চলাই ঠিক? সেদিন থেকে শিষ্যরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাইমাখা, আসন-বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধুনী ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে-গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড়দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভালো খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনোমতো হল না। তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে, শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে—কখনো উর্ধ্ববাহু হয়ে দুই-হাত আকাশে তুলে কখনো হেটমুণ্ড হয়ে দুই-পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটিকুল, তারপর সারাদিনে একটিবেলপাতা, ক্রমে একফোঁটা জল, তারপর তাও নয়—এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে। শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সেদিকটা ভারি নির্জন। ঘন-ঘন শাল-বন সেখানটা দিনরাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সেদিকে বড় একটা আসে না; দু-একটা হরিণ আর দু-দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শাল-পাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র। এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোটা-মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুল-ফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এদিকে আসে, তখন কোনো-কোনো দিন

তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া-কাপড়-পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনো-কোনো দিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছের তলা আলো করে সোনার কাপড়-পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন। কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনো দিন দেখেনি—পুন্না ছাড়া। মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর-একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর।

সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে এক-বছর বটতলায় রোজ ঘিয়ের পিদিম নিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভালো করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনারচাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ এক-বছর সে আসছে, কোনো দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনো সে আসবার আগেই ছায়ায় মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনো বা সে-গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন। আজ শীতের কমাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো—যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ-কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা সেইদিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দুটি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছিলেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনোদিন স্পষ্ট করে

দেখা দেন, কি কথা কন তবে যেন পুন্না বলে—দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে, আমার বাবাকে, আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভালো রেখ। বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই। এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দুটি ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীটির উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেল-বেলায় সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে-পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ওপারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে-মাঝে আমকাঁঠালের বাগান-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রামগুলি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ির শাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের উপর ঝুলি-বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাত-দুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে-ঘুরতে আস্তে-আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালোমোষ—একটার পিঠে মস্ত-একগাছ লাঠি-হাতে বসে রয়েছে

গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে আরে রে পুন্না রে! ছেলেটার নাম সোয়াস্তি।

পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম-পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যেদিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেই দিকে চলে গেল। তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের উপর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার-দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না—দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া-বসন-পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদীটিতে।

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গরু-বাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে –"মা.আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দুজনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা?

সুজাতা বললেন—"যদি মনে পড়ত তবে কি চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বুঝি? পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত-থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে

গরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে—দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন-- তুই গোটা কতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক। পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা, চল, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না? সুজাতা জ্বাল-দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন – তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই। সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া। ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে-আগে দুধের ভীড় নিয়ে ঝুমুর-ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পূজার থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু-একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন—'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!"

সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল। তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন।

তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এরি মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুটের ধোঁয়া শাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে-ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলু-বনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু-একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিংপাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপ-ঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল। আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন-- বটগাছের নিয়ে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথায় আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পূজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি; তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনো বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদীর উপরে বিছিয়ে দিয়ে মনে-মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে-ধোয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় পৃথিবীর শেষ-পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট, পরিষ্কার। পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ

দেখবই-দেখব—সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

তখন 'মার'—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায়, কুকর্ম করায়—সেই 'মার'-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার-মার শব্দে বুদ্ধের দিকে। চারিদিকে আজ 'মার'-এর দলবল জেগে উঠেছে। তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধূলা—জল-স্থল-আকাশের কালোর পদ টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্ত-বৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে-নিবে যাচ্ছে। আকাশকে এক-হাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, 'মার' আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর–যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তরোয়াল, মাথার মুকুটে দুলছে 'মার'-এর প্রকাণ্ড একটা রক্তমণির দুল, তার কানে দুলছে মোহন কুণ্ডল, তার বুকের উপর জ্বলছে অনল-মালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা। বুক ফুলিয়ে

'মার' সিদ্ধার্থকে বলছে—"বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা! উত্তিষ্ঠ—ওঠো! কামেশ্বরোহস্মি—আমি 'মার'। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহাবিষয়স্থং বচং কুরুন্ধ—ওঠে চলে যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা কর না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কি লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারো সাধ্যে নেই।"

সিদ্ধার্থ 'মার'-কে বললেন—"হে মার'! আমি জন্ম-জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি—তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এই প্রতিজ্ঞা—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার 'মার' বললে—"উত্তিষ্ঠ, চলে যাও, তপস্যা রাখ!"

তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, "না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে আমন যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ

মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধ হয় তার কালো জিভ বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল! ‘মার’ সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মতো দু'পাটি শাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে; আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে ‘মার’-এর দল; চন্দ্র সূর্য ঘুরছে তাদের হাতে দুটো যেন আগুনের চরকা! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—‘মার’-এর দল ঘূর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো। পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বনবন শব্দে ঘুরিয়ে ফেলেছে তারা চারিদিকে থেকৈ অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো; লক্ষ-লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে মার-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে! তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা আঁজলা-আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে -- সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদীর আশেপাশে। উরাইল-বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমন কি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে; জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুন মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শানিয়ে মশাল জ্বলিয়ে, দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ছে আজ বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন-নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘূর্ণিবাতাসে ঘুরে-ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে-ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে ‘মার’ ডাকছে—‘হান! হান!

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ ‘মার’-এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে ‘মার ‘। তার ধুলোমাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ জোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে-দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থর-থর কাঁপছে! মহামারীর গায়ের বাতাস যেদিকে লাগল সেদিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন-উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে। জগৎ জুড়ে উঠেছে মারী'র আর্তনাদ, ‘মার’-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ। তখন রাত এক প্রহর। ‘মার’-এর দল, ‘মারীর’ দল উল্কামুখী শিয়ালের মতে, রক্ত -আঁখিবাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে–যেন দুখানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে। ‘মার’ দুহাতে দুটো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে—‘পালাও, পালাও, এখনো বলছি তপস্যা রাখ!’ বুদ্ধদেব ‘মার’-এর দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না। ‘মার’-এর মেয়ে ‘কামনা, তার ছোট দুইবোন ছিলা-কলা’কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে যত চেষ্টা করছে—কখনো গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনো যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাত-জোড় করে কেঁদে-কেঁদে লুটিয়ে পড়ে। তাঁর মন গলাবার, ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনো তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ

তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে ‘মার’-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু বরুণ, জল-স্থল-আকাশ—সেই ‘মার’-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার’ আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে ‘মার’ একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই। দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ‘মার আস্তে-আস্তে পারিয়ে গেছে--নরকের নীচে, ঘোর অন্ধকারে, চারদিক কালো করে দিয়ে। বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন, ধ্যান ধরে প্রহরের পর প্রহর। রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু ‘মার’-এর ভয়ে তখনো পৃথিবী এক-একবার কেঁপে উঠছে—চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না সেই সময় ধ্যান ভেঙে ‘মার’কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধ দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ-হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাতরঙের আলো। সেই আলোতে জগৎ-সংসার আনন্দে জয়-জয় দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। বুদ্ধের পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি একূলে ওকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারাল খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছেন। আর ঋষিপত্তনের নিচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড়-বড় সব গুহা-গর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাড়ের উপরেই সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরই

গাছে গাছে ছায়া করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় খায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারু ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান; দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তাঁরা আর বার হন না দেবলঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে রয়েছেন। তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না—রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না। সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনো আষাঢ়ন্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুলি তখনো আস্তে-আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোট-ছোট সবুজ পাখিগুলি এখনো যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা শাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলি নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে—সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন পারে বাসা বাঁধবে। বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মানটিকে টানছে—সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে। সেই তেঁতুলগাছের ছায়া-করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে! দেবলঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এদিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে। আজ সে কত-বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ

বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায় কি না-যায়। সকাল থেকে একটির পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার যার দেশে নামিয়ে দিতে-দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে 'যাবে গো!' বলে ডেকে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে—অনেকদূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে—নদীর জলে একটি ছোট পিদিম ঝিক-ঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এদিকে আর নৌকা আসবে না। নালক মনে-মনে দেবলঋষিকে প্রণাম করে বলছে—ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।"

দেখতে-দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোট নৌকায় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সেই সময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

কত দেশবিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলোয় ভিড়তে ভিড়তে নালকদের নৌকাখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে।

জায়গায় ঘাট থেকে নুতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনো চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মতো জল কেটে, কখনো বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটি আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে-

দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চরগুলো সব ডুবিয়ে দিয়েছে। নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে-ধারে বাঁশঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থৈ-থৈ করছে জল! খালবিল খানা-খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে—বষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে-ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে-আস্তে সেই ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে-ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সেদিন কবে আসবে, যেদিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা-পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন। নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারী দাঁড়িয়ে গাইছে—

‘এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!

ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানি— দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানির বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানি সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানি মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুকে-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানি রাজার প্রাণ!

আর দুওরানি— বড়োরানি, তাঁর বড়ো অনাদর, অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন-- ভাঙাচোরা।এক দাসী দিয়েছেন-- বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুওরানি—ছোটোরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারোমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও। রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস হয়ে গেল। ছ’খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন— কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটো রানি— সুওরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটোরানিকে বললেন—রানি, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কী আনব?

রানি ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন,—হীরের রঙ বড়ো শাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ খেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা-পা নাচিয়ে-নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশ গাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব। রানি গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো বড়ো ছোটো, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্ত আছে, তারি এক ছড়া হার এনো। রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কী আনব রানি? তখন আদরিনী সুওরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন— মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি হাসি মুখে বিদায় দাও, আকাশের মত নীল, বাতাসের মত ফুরফুরে, জলের মত চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোট রানি হাসি মুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন— মনে পড়ল দুঃখিনী বড়োরানিকে। দুওরানি—বড়োরানি ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন। ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাড়িয়ে বললেন- বড়োরানি, আমি বিদেশ যাব।

ছোটোরানির জন্য হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কী আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানি বললেন—মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পড়ে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারীর পায়ে সোনার নূপুর পড়িয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল। অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায়, সোনার শাড়িতে কি কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাতমহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু মহারাজ, শোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন— না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কি সাধ? রানি বললেন— কোন লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ আমার জন্য পোড়ামুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন— আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়রানি— দুয়োরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটীয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধেবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিমে মুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুওরানি নীল সাগরের পানে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিনী সুওরানি সাতহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে-শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়রানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটরানির সেই হাসি-হাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানি কি করছেন? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কি করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে-ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। .সোনার সুতো, ফূলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানির চক্ষে ঘুম এল না।

সুওরানি—ছোটরানি রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়রানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো-মাস কেটে গেল।

তেরোমাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের সান্ মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুওরানির চুড়ি

গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিন্‌কি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝঙ্কার—মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ড়িম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুওরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ'মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ

মিলিয়ে, সেই নীল রেশমের শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মত নীল, বাতাসের মত ফুরফুরে, জলের মত চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শারি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুওরানির শখের শাড়ি কিনে নিলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটোরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়রানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর, বড় ভুল হয়েছে। বড়রানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে, লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটরানির সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানি সাত-মহল বাড়ির সাত-তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দরি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চিয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটোরানির সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন—এই নাও, রানি! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশে রাজার মেয়ে এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, এক দিন পরে পূজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ! পৃথিবী খুজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ!

রানি -তখন দু’হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু’পায়ে দশ-গাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আল্গা হল; দু-পা যেতে দশ-গাছা মল সানের উপর খসে পড়ল। রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন!

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে-বহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটরানি আট-হাজার মানিকের আট-গাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশ-গাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা, শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে, বললেন—ছাই গহণা! ছাই এ-শাড়ি! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ-চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন দেশের ধুলো বালিতে এ-মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহণায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিন-মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকান-পাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে-শাড়ি, সে-গহনা রানির গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি পরতে পারে না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ, যাকে বৌ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী, বানরটা বলে কি? ছেলেই হল না বৌ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, তুমি

স্যাকরার দোকানে ছোটরানির নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানির নতুন শাড়ি বুনতে দাওগে। এ-গহনা, এ-শাড়ি রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ; যদি বৌ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়রানির কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়রানি, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাদঁতে-কাদঁতে বললেন—মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কি আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়রানির কোলে বাঁদর-ছানা দিয়ে বললেন—মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। তোমার এ-ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে, সেখানে তা তো নেই। রানি, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনে শাড়ী দিয়েছি, ছোটরানি পায়ে ঠেলেছে; আর কানা-কড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানি, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি! কিন্তু দেখো, ছোটরানি যেন জানতে না পারে! তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায় বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়রানিকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন। আর বড়রানি সেই ভাঙা ঘরে দুধ-কলা দিয়ে সেই বাঁদরেরর ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটরানির সাতমহলে সাতশ দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়রানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল! বড়রানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটা চালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচলো না। বড়রানি সেই ভাঙা ঘরের দুঃখের দুখী, সাথের সাথী বনের বানরকে কোলে নিয়ে ছোটরানির সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলেরবাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়রানিকে যখন দেখে তখনই রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখেনা।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাদিস কেন? তোর কিসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানি বললেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে আম্‌র সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশ দাসী আছে, সাতসিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটোরানি আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে জাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশ দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙ্গালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বৌ হলুম, সাতশ দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মত রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনার

চাঁদ রাজপুত্র! হায়, কতজন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাধ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এজন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙ্গালিনী হয়েছি! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে-বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে, চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে—মা, তুই কাঁদিস নে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাবো, তোর সাতমহল বাড়ি দেবো, সাতখানা মালঞ্চ দেবো, সাতশো দাসী ফিরে দেবো, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেবো তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে-কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে-তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কি তপস্যা করে কোন্ দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক্, আমার রাজা সুখে থাক্, আমার সতীন সুখে থাক্, আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক্, তোর এ অসাধ্য-সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে—না মা, আমার কথা না-শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি-শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটরানির সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়রানির জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নবৎ বাজল, রাজারানির ঘুম ভাঙলো।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে রাজ-দরবারে নেবে গেলেন—আর ছোটরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়রানি কি করলেন?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন ওপাশ দেখলেন—বানর নেই! রানি এ-ঘর খুঁজলেন ওঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন—বানর নেই! বড়রানি কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না-পোহাতে। রাজ-দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাই-সান্ত্রীরর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কি? একথা কি সত্য? বড়রানি দুওরানি, তার ছেলে হবে? দেখিস্ এ-কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুওরানিকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

বানর নাচতে নাচতে—ভাঙা ঘরে দুওরানি পড়ে-পড়ে কাঁদছেন—সেখানে গেল।

দুওরানির চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে—এই দেখ্ মা, তোর জন্যে কি এনেছি! তুই রাজার রানি, গলায় দিভে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর!

রানি বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন—এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার! যখন রানি ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই-এ হার কোথায় পেলি? বল্ বানর, রাজা কি এ-হার ফেলে

দিয়েছেন, রাজপথে কুড়িয়ে পেলি? বানর বললে -না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানি বললেন— তবে কি রাজার ঘরে চূরি করলি?

বানর বললে— ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সু-খবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানি বললেন-ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর। ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কি সুখের সন্ধান পেলিযে রাত না-পোয়াতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি!

বানর বললে— মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম-রাজামহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইত রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন। রানি বললেন— ওরে, রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন। হায় হায়, কি করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কি সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি!

বানর বললে— মা তোর ভয় কি, ভাবিস কেন? এ দশমাস চুপ করে থাক। সবাই জানুক— বড় রানির ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনার চাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানি বললেন— চল্ বাছা চল্। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানি ভাঙা পিঁড়েয় বানর কে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটরানির ঘরে গেলেন।

ছোটরানি কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে .সোনার পালঙ্কে বসে-বসে ভাবছেন এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন— আরে শুনেছ ছোটরানি, বড়রানির ছেলে হবে! বড় ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে সে ভাবনা ঘুচল! যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানি, বড় ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানি বললেন— পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন— সে কি রানি? এমন সুখের দিনে এমন কোথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, একথা শুনে মুখ-ভার করে? রানি, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানি বললেন--

আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে সিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচল তাঁর খবর রাখিনে। বাবারে, সকাল বেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

রাতভরে ছোটরানি আটগাছা চুরি, দশ গাছা মল ছমছমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড় রাগ হল। রাজকুমার কে ছোটরানি মর্ বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানি তে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটরানির মুখ দেখলেন না, বররানির ঘরেও গেলেন না— ছোট রানি শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বররানিকে নয় প্রাণে মারে! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন।

একমাস গেল, দুমাস গেল, দু মাস গিয়ে তিন মাস গেল, রাজা-রানির ভাব হল না।ঝগড়ায়-ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুওরানির পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন— কি হে বানর, খবর কি?

বানর বললে—মহারাজ, মায়ের বড় দুঃখ!মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়েকাহিল হলেন।

রাজা বললেন— একথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনি সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়রানিকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়রানিও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে গেলেন। আর রানির বানর মোহরের তোরা নিয়ে রানির কাছে এল।

রানি বললেন – আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন? খাব কখন?

বানর বললে—মা, আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানি নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলজন ঘরামি নিলে, ষোলোগাড়ি খড় নিলে, ষোলশ বাঁশ নিলে। সেই ষোলশ বাঁশ দিয়ে, ষোলোগাড়ি খড় দিয়ে ষোলজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুওরানির বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানির ভাত নিয়ে এল; ষোলো মোহর বিদায় পেলে!

দুওরানি নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন—নতুন ঘর। ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আলনায় নতুন শাড়ি! রানি অবাক হলেন। বানর কে বললেন—বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বললে—মা, রাজা-মশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে

ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত; সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল্।

রানি খেতে বসলেন। কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানি রাজভোগ খান আর ভাবেন—আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে-ভয়ে এক মাস, দুমাস, তিন মাস গেল। বড়রানির নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন—কি বানর, কি মনে করে?

বানর বললে—মহারাজ, ভয়ে কবো না নির্ভয়ে কবো? রাজা বললেন—নির্ভয়ে কও।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড় দুঃখ পান।

ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতের হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে নেপ পান না, আগুন জ্বালাতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন—তাইতো তাইতো! একথা বলতে হয়। বানর, তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি। বানর বললে—মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটরানি বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন—সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানিকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কটাব, গড়ের দুয়ারের পাহারা বসাব, ছোটরানি আসতে পারবে না। সে মহলে বড়রানি থাকবেন, বড়রানির বোবা-কালা দাই থাকবে? আর বড়রানির পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে—মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন—যাও মন্ত্রী মহল সাজাও গে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়রানির নতুন মহল সাজালেন।

দুওরানি ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোট রানির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী—ছোটরানির 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটরানি বলে পাঠালেন—মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে। রানি ডেকেছেন—ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল। রানি বললেন— এস ভাই, মনের কথা, কেমন আছ?

কাছে বোসো। ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটরানির পাশে বসে বললে—কেন ভাই ডেকেছ কেন? মুখখানি ভারভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কি? রানি বললেন—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সতীন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানি হয়েছে। ভিখারিনী দুওরানি এতদিনে সুওরানির রানি হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতিনের এই আদর প্রাণে সয় না। ব্রাহ্মণী বললে—ছি! ছি! সই। ও কথা কি মুখে আনে! কোন্ দুঃখে বিষ খাবে? দুওরানি আজ রানি হয়েছে, কাল ভিখারিনী হবে, তুমি যেমন সুওরানি তেমনি থাকবে।

সুওরানি বললেন—না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুওরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য পাবে! লোকে বলবে, আহা, দুওরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুওরানি মহারাজার সুওরানি হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারা দিন উপোস যায়। ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই

ব্রাহ্মণী বললে—চুপ কর রানি, কে কোন্‌দিকে শুনতে পাবে! ভাবনা কি? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুওরানিকে খেতে দিও। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানি বললেন—যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে-না-খেতে বড়রানি ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে— ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়রানিকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুঁজে-খুঁজে ভর-সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটরানি সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়লেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন–ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়রানিকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়রানির নতুন মহলে গেল।

বড়রানি বললেন—আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুওরানি বলে কি ভুলে থাকতে হয়?

ডাকিনী বললে—সে কি গো! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কি ভুলভে পারি? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানি দেখলেন, বুড়ি বাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দুহাতে দুমুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে-হাসতে চলে গেল।

রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন—ব্রাহ্মণী আমায় কি খাওয়ালে! গা-কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে—চল্ মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানি উঠে দাড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানি চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা সানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানির মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে—রানি অজ্ঞান, অসাড়!

বানর সোনার প্রতিমা বড়রানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কি লতাপাতা, কোন গাছের কি শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়রানিকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল—বড়রানি বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানির মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটভে সঙ্গে এলেনা রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লস্কর, দাসী-বাঁদী যে যেখানে ছিল হাজির হল। বানর বললে—মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়রানির মহলে নিজে রইলেন।

তিন দিন, তিন রাত বড়রানি অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়রানি চোখ মেলে চাইলেন। বানর রাজাকে এসে খবর দিলে—মহারাজ, বড়রানি সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবতী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে বললেন –

চল বানর, বড়রানিকে আর বড়রানির ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে—মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়রানিকে দেখে এস ছোটরানি কি দুর্দশা করেছে। রাজা দেখলেন – বিষের জ্বালায় বড়রানির সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, পাতখানার মত পড়ে আছেন, রানিকে আর চেনা যায় না।রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোট রানিকে প্রহরী খানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন। তারপর হুকুম দিলেন—মন্ত্রীবর, আজ বড় শুভদিন, এতদিনে পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি. তুমি পথে-পথে আলো জ্বালাও, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়াও, দীন দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারী না থাকে। মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে-পথে আলো দিলেন, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন –দু:খীকে রাজভাণ্ডার দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল। রাজা বানরকে ডেকে বললেন-দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও!

বানর বললে – মহারাজ, আগে ছেলের বৌ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখ! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে। রাজা বানরের কথায় দেশে বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের

কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে য পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটোয় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল! কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু – বাঁকাধনু দুটি চোখ

টানা-টানা, দুটি ঠোঁটি হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায় পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল। বানর কে ডেকে বললেন – ছেলের বৌ ঠিক করেছি, কাল শুভ দিন শুভ লগ্নে বিয়ে দিতে যাব। বানর বললে – মহারাজ, কাল সন্ধে বেলা বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব। রাজা বললেন –

দেখ বাপু, দশ বৎসর তোমার কোথা শুনেছি কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে – মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব। রাজা পাছে রানির ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয় তারাতারি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন আর বানর নতুন-মহলে বড়রানির কাছে গেল। বড়রানি ছেলে বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন--

ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কি ছলে ভোলাব! বানর এসে বলল— মা গো মা, ওঠ্। চেলির জোর, মাথার টোপর আন্, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানি বললেন – বাছারে প্রাণের কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কি ছলে ভলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতীন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে-ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা খান্ত দে কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস! তুই রাজা কে ডেকে আন্, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে – রাজাকে পাব কোথায়? দু-দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে বসে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বর অপমান। মা তুই ভাবিস নে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানি বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মত ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলীর জোড় পরালেন, সোনার টোপর পারালেন, জরির জুতো পায় দিলেন।

বানর চুপি চুপি ক্ষীরের বর পাল্‌কিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু'খানি ছোট পা, দু-পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোল জন কাহার বরের পাল্‌কি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ী, কোমরে চাদর বেঁধে নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জালিয়ে, ক্ষীরেরে পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানি আঁধার পুরে একলা বসে বিপদ-ভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঢাকি-ঢুলি,

ঘোড়ায় চড়ে বর যাত্রী – সারা রাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগ্‌নগরে এসে পড়ল।দিগ্‌নগরে দিঘির ধারে ভোর হল।মশাল পুড়ে-পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে-ছুটে বেদম হল, কাহার পাল্‌কি বয়ে হয়রান হল। ঢাক পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দীঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দীঘির ধারে

ষষ্ঠীতলায় বরের পাল্‌কি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে--

মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম—বরকে যেন কেউ না দেখে;   আজকের দিনে বর দেখলে বড় অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন, দীঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল   না। গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুণের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুণ

কাঠামোর ভীতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুণের কালো বেড়াল মিউ-মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পাল্‌কির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল। - ষষ্ঠীঠাকরুণের ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি, মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস যেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে,

সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশছেড়েদিগ? দিগ্‌নগরে এলে ন। য-ষষ্ঠীর পায় প্রণাম করে বললেন—ঠাকরুণ, দিন-দুপুরে ডেকেছেন কেন? ঠাকরুণ বললেন-বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির- ভিতর ক্ষীরের পুতুটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মাযা করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল রাজার মন্ত্রী

হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন । দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন-জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দীঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানির বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল,। গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কূনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগরে দীঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, ভিতর ঘরে-ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে –

ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে। দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, .লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছোড় দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দীঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা আমার বরে দুওরানি তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে— কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো যষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য সেখানে কেবল। ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্হলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপূর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি। বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝম্‌ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্‌ হাঁকাচ্ছে, একদল দীঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কূড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে,।

চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না।সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য। সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, ভেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে-গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে। গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন! নদীর পারে জন্তীগাছটি

তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীলে ঘোড়া মাঠে-মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ুর পখে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ুর ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডূলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরানির বিয়ে দিতে যাচ্ছে বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকেঝাঁকে টিয়ে পাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছেবসে কেঁচ্মেচ্ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাত ঘষে। সে এক নতুন দেশ সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সেই দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দেলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে-গুণতে মাছ ধরতে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে।--

এমন সময় টাপুর-টুপুর বৃষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের ফিরেকোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকা বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন, বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন; বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে- মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো-কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু-পাশে দুই

রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরু ঠাকুর নিলেন, আর একটি নায় ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে-নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে – ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি। ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। যষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিনসে্ কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আম কাঁটালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানিকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে-যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে।

গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড় গুলো নাচতে-নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল--

দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!

বানর দেখলে—কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুণ, কোথায় কে? বটতলায় দীঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পাল্কি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগ্ নগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে-বসে রাজা ভাবছেন -বানর এখনো এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে-না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে— আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে। রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে— কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব! এমন সময় গুরু-গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টক্‌বক্‌ ঘোড়া হাঁকিয়ে ঝক্‌মক্‌ আলো জ্বালিয়ে, বানর বর নিয়ে এল রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শী বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে-বর কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বৌ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানি দু-দিন দু-রাত কেঁদে-কেঁদে, ভেবে-ভেবে ভোরবেলা ঘুমিয়ে-ঘূমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন –ষষ্ঠীঠাকরুণ বলছেন, রানি, ওঠ্‌ চেয়ে দেখ তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে—ওঠ গো রানি ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বৌ-বেটা বরণ করগে!

রানি পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন।এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বৌ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের- ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে-ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটরানি বুক ফেটে মরে গেল।